মৌলবাদ : উৎস সন্ধান , ইতিবৃত্ত এবং নিরাময়ের রণনীতি –রণকৌশল

রবিউল ইসলাম

প্রথম কিস্তি

উপক্রমণিকাঃ-- রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছেন, যে মতবাদ একদিন মানব সমাজকে মুক্তি দেয় বিপ্লবের মাধ্যমে, সেই মতবাদই কালের বিবর্তনে এক সময় মানুষের পায়ে বেড়ী পরিয়ে দেয় । সভ্যতার পথে তাকে এগোতে দেয় না । এক পা যখন সামনের দিকে যায়, অন্য পা তখন পেছন দিকে টেনে ধরে । ইতিহাসের পরতে পরতে আমরা রবীন্দ্রনাথের এই অমর শিক্ষামূলক বাণীর সাক্ষ্য খুঁজে পাই । ইসলাম আরবের মানুষকে মুক্তি দিয়েছিল দাসত্ব, জাহেলিয়াত তথা অজ্ঞানতা, মাৎসান্যায়, বংশানুক্রমিক হত্যাকান্ড এবং গোষ্ঠীপতিদের শোষন ও অত্যাচার থেকে । আরব বিজয়ে দক্ষিণ ভারতে এবং তুর্কীবিজয়ে উত্তর ভারতে বিভিন্ন ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়েছিল । পঞ্চদশ ও ষোড়ষ শতাব্দীর য়ুরোপে যখন ধর্মবিপ্লবের নামে নরহত্যা ও যুদ্ধবিগ্রহের বিয়োগান্তক নাটক অভিনীত হচ্ছিল, অনেকটা সমসাময়িক কালেই ভারতবর্ষে ধর্মসংস্কারান্দোলন কেবল শান্তিপূর্ণভাবেই নয়, বরং প্রেম ও ভক্তিবাদের প্রবাহের ভিতর দিয়েই সম্পন্ন হয়েছিল । ইসলাম ও বিশেষ করে সূফিদের সাম্য-মানবতা ও প্রেম-ভক্তির উদার মতবাদ ও দর্শনের প্রভাবে(তাঁরা নিজেরা আবার প্রভাবিত হয়েছিলেন বেদান্ত দর্শন দ্বারা) সেযুগে রামানন্দ, কবীর, দাদু, তুলসীদাস, রবিদাস, তুকারাম, মুলুকদাস, ধর্মদাস, নানক, সুন্দর দাস প্রমুখ সাধক-মহাত্মাগণ আবির্ভূত হয়ে ভারতের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে এক অভূতপূর্ব ভাববিপ্লব ও চিত্তজাগরণ ঘটিয়েছিলেন । এই ভাববিপ্লবের প্রভাবে ভারতে বিভিন্ন সম্প্রদায়, গোষ্ঠী ও বর্গের(যথা-শ্রমের ভিত্তিতে ও বর্ণের ভিত্তিতে) মধ্যে একজাতীয়তার ভাব সৃষ্টি না হলেও যুগ যুগের দূরত্ব ও ব্যবধান অনেকটাই ঘুচে গিয়েছিল, যা পরবর্তীকালের হিন্দু-মুসলিম সাংস্কৃতিক বিনিময়ের দ্বার খুলে দিয়েছিল । দুঃখের বিষয়, সমন্বয় ও বিনিময়ের এই ধারা পরবর্তীকালে ব্রিটিশের অশুভ-দুষ্ট চক্রান্তে ধ্বংস হয়ে যায় । শেখ জালালুদ্দীন তাবরেজী, শেখ বাহাউদ্দীন জিক্‌রিয়া, কুতবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী, হজরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি প্রমুখ সূফিসাধকগণের দর্শন ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভাবাদর্শগত পারস্পরিক বিনিময়-আদানপ্রদানের একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল । এরই সূত্র ধরে সেযুগে মুসলিম সংস্পর্শে ভারতবর্ষে সাহিত্যে, স্থাপত্যে, চিত্রশিল্পে, সংগীতে সর্বক্ষেত্রে যেন নব নব ধারার সৃষ্টি হয়েছিল। সংক্ষিপ্ত পরিসরে এর বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়, আর প্রাসঙ্গিকও নয়, তাই আমি শুধু যথা সম্ভব স্বল্প কথায় প্রধান প্রধান ধারার অবদানগুলি বিবৃত করার চেষ্টা করব ।

মুঘলশক্তি ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর পারসিক চিত্রশিল্পের শাখাগুলোতে অভিজ্ঞ শিল্পীগণ ভারতবর্ষে আসা শুরু করেন । এঁদের প্রভাবে বিদেশী ও দেশী দুটি স্বতন্ত্র চিত্রশিল্পী সম্প্রদায় পরস্পরের মধ্যে যে সৃজনশীল আদানপ্রদান ঘটেছিল তার ফলে মুঘল ধারার সাথে দেশীয় ধারার সংমিশ্রণের সুযোগ সৃষ্টি হয় । তারই চমৎকার ফসল হলো 'নিমত্‌নামা' পান্ডুলিপির চিত্রাবলী যা মালোয়ার রাজপুত শিল্পদের কীর্তি বলে ধারণা করা হয় । সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মীর্জা খাঁয়ের সময় সংগীত ও চিত্রশিল্পে যে অভূতপূর্ব সংযোগ সাধিত হয়েছিল সেটাও ছিল হিন্দু-মুসলিমের মিলিত অবদানের ফল । হিন্দুদের ধর্মক্ষেত্রের মতো মঈনুদ্দীন চিশতি বা সেলিম চিশতীর দরগাহ্‌গুলিতে সংগীতের চর্চা শুরু হয় । হিন্দুমুসলমানের সম্মিলিত সাধনারই দান হলো আজকের হিন্দুস্থানী বা শাস্ত্রীয় সংগীত । যে তবলার সংগত ছাড়া হিন্দুস্থানী সংগীত অচল তা' কিন্তু মুসলিম বাদ্য । ভারতীয় সংগীত জগতে প্রথম উল্লেখযোগ্য মুসলমানের নাম শেখ বাহাউদ্দীন জাকারিয়া । তিনি ১২৬৭ খ্রীষ্টাব্দের দিকে মুলতানী ও মুলতানী-ধানশ্রী রাগ দুটি প্রচলন করেন । এর পরেই আমীর খসরুর নাম উল্লেখযোগ্য যিনি সেতারের প্রবর্তক । সেতার যন্ত্রটি হিন্দু ও মুসলিমের দুটি যন্ত্রের সমন্বয় । তিনিই পারসিক রাগ ইমনকে ভারতীয় সংগীতে অঙ্গীভূত করেন । তিনি সনাতন ভারতীয় সংগীতকে রক্ষণশীল ঐতিহ্যের বন্ধন থেকে মুক্ত করেন । ঐতিহাসিকদের মতে তিনি ছিলেন হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সংগীতের জনক ।

বলছিলাম (উপরোক্ত) সূফী দরবেশদের আত্মিক ঐশ্বর্য ও ব্যক্তিত্বের কথা । তাদের ইসলামি সাম্যবাদ অর্থাৎ ব্যক্তির মনুষ্যত্বের প্রতি মর্যাদা ও সমাধিকারের নীতি তখন স্থানীয় নিম্ন বর্ণের, বর্গের বা গোত্রের দলিত হিন্দুদেরকে আকৃষ্ট করেছিল । সম্ভবত তারা লক্ষ্য করেছিল যে (পঞ্চদশ শতাব্দীতে) ইসলামের সামাজিক সাম্যের আদর্শকে অনুসরণ করেই তুর্কী-আফগান রাজত্বের সময়, বিশেষ করে ইলিয়াস শাহের শাসনামলে, কোন বংশপরিচয় দিয়ে নয় বরং নিজস্ব প্রতিভা, যোগ্যতা-দক্ষতার বলে ক্রীতদাসরা রাজপ্রাসাদের রক্ষক থেকে শুরু করে পরামর্শক, অধিকাংশ উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী বা অমাত্য এবং সেনাপতি পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিল । যেমন, গজনীর সুলতান আলপ্তীগীনের ক্রীতদাস ও জামাতা সবুক্তগীনের পুত্র মাহ্মুদ ৯৯৭ সালে নিজগুনে সুলতান হয়েছিলেন, আর মুহম্মদ ঘোরীর ক্রীতদাস শিহাবুদ্দীন ঘোরী হয়েছিলেন দিল্লীর প্রথম সুলতান । এভাবে অনেক দাস রাজজামাতা ও দিল্লীর বাদশাহ্ হয়েছিলেন স্বীয় যোগ্যতার বলে-মনুসংহিতা নির্দিষ্ট জন্মসূত্রে বা বংশসূত্রে নয় । চোখের সামনে স্বকীয় যোগ্যতায় আত্মোন্নতির এই ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত নিম্নবর্গের হিন্দুদের মনে এক নতুন জীবন-জিজ্ঞাসা ও মনুষ্যত্বের মর্যাদার নতুন দিককে যেন আলোয় উদ্ভাসিত ও উন্মোচিত করে তুলল । জন্মসূত্রে সর্বপ্রকার অধিকারবঞ্চিত এই দলিতদের আর্থিক ও সামাজিক জীবনে মনুষ্যত্বের ও আত্মমর্যাদা লাভের আকাঙ্খা তাদেরকে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র ও সমাজদ্রোহী করেছিল । এভাবেই ইসলামী আদর্শের প্রভাব উত্তর ভারতের বাইরে দ্রাবিড় দেশে ভক্তি আন্দোলনের জন্ম দিল,- উত্তর ভারতে নিয়ে এলেন রামানন্দ, আর সপ্তদ্বীপ নবখন্ড পৃথিবীতে ভক্তি প্রচার করলেন তাঁরই শিষ্য কবীর ।

কবীরের আহ্বানে শাস্ত্রজ্ঞানহীন সাধারণ মানুষের জীবনে এই সাধনা অচিরেই এক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শক্তি লাভ করে । সুতরাং এটা বলা যায় যে আরব বিজয়ে দক্ষিণ ভারতে এবং তুর্কীবিজয়ের প্রেক্ষাপটে উত্তর ভারতে ইসলামী সামাজিক সাম্যের প্রভাবে নবযুগের উন্মেষ সূচিত হয় ।

তাৎপর্যের দিক থেকে একে য়ুরোপীয় ইতিহাসের Protestant Reformation-এর সাথে তুলনা করা যাবে কি ? সম্ভবত যাবেনা । সেখানকার মহান সংস্কারকগণ যে পথ অবলম্বন করেছিলেন তাকে ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্রীয় ভাষায় জ্ঞানমার্গ বলা যায়, অর্থাৎ যুক্তিতর্ক, দর্শন-ধর্ম ইত্যাদির আলোচনার মাধ্যমে সেখানে সংস্কার আন্দোলন গতি ও প্রাণ পেয়েছিল । ভারতবর্ষে দর্শন জ্ঞানমার্গ হিসেবে থাকলেও ভক্তিটাও ছিল সমানভাবে প্রবল । আর যদি যুক্তিবাদের কথা বলতে হয়, তাহলে কিন্তু গোতম বুদ্ধ বাইবেলপন্থী রিফর্মারদের চেয়ে অনেক বেশী যুক্তিবাদী ছিলেন । কারণ, তিনিই সর্বপ্রথম বলতে পেরেছিলেন, 'যেকোন মতবাদ বা ধর্মকেই তুমি বিনাপ্রশ্নে গ্রহণ করবেনা, যাচাই করে নেবে । তিনি মানুষের কর্মের ফলাফলের জন্য, আত্মার মুক্তির জন্য(সম্ভবত এটা তিনি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন সেযুগের অজ্ঞতা ও পারিপার্শ্বিকতার কারণে; সম্ভবত তিনি নির্বাণ বলতে মানবমুক্তি বুঝিয়েছিলেন) এযাবতকাল পর্যন্ত ঐশীনির্ভরতাকে নাকচ করে দেন । কিন্তু বাইবেলপন্থীরা ঠিক আপন কর্মও নয়, মানবমুক্তিও নয়, বরং যীশুর দয়ায়ই পারলৌকিক মোক্ষ বা মুক্তিলাভের ধারণায় বিশ্বাস করে এসেছে ।

যাই হোক, চৈতন্যদেবের ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন প্রসঙ্গে ডক্টর আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ্ লিখেছেন, "চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব আন্দোলন যে হিন্দুর সমাজ সংরক্ষণেরই ইসলাম প্রতিরোধক পরোক্ষ আন্দোলন, এ সিদ্ধান্ত নিয়ে আজ আর তর্ক নেই । কেবল বৌদ্ধ ও অনুরুপ শ্রেণিকেই নয়, ধর্মান্তরিত হিন্দুকেও সমাজে পূর্ণগ্রহণের সার্থক উপায় হিসাবেই যে প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের আহ্বান ধ্বনিত হয়েছিল, তাঁর প্রত্যাশিত ফলও পাওয়া গিয়েছিল,..... .....ষোল শতক থেকেই বাঙলায় ইসলামের অব্যাহত প্রসার রুদ্ধ হয়ে গেছে,.....।" **[১] একই বক্তব্যের প্রতিফলন পাওয়া যায় কিছুটা ভিন্ন ভাষায় সুরজিত দাশগুপ্তের 'ভারতবর্ষ ও ইসলাম' গ্রন্থে ।

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সূচিত মাতৃভাষা অবলম্বন করে সাহিত্যের চর্চা পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে গিয়ে

অনেকটাই সমৃদ্ধ হয়ে উঠিছিল । সংস্কৃতের আশ্রয়ে উত্তর ভারতের যেসব ভাষা এতকাল সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা হিসেবে প্রচলিত ছিল সেগুলির অধিকাংশ মুসলিম সংস্পর্শে এসে উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের মাধ্যম হয়ে উঠেছিল-যেগুলির মধ্যে রাজস্থানী, পাঞ্জাবী, গুজরাতী, পূর্বী হিন্দী, বাংলা, অসমীয়া প্রভৃতি সাহিত্য প্রধান । পঞ্চদশ শতাব্দীর হিন্দী সাহিত্যের পথিকৃত ছিলেন সাধক কবীর । প্রেম-ভক্তি ও উদার মরমীবাদের সংগে ভোজপুরী, কোশলী, খাড়ীবেলী ও ব্রজভাষা প্রভৃতি বিবিধ ভাষার মিশ্রণের অভাবনীয় সমন্বয়ের ফলে যে অনবদ্য ও মাধুর্যময় আবেদন সৃষ্টি হয়েছিল, তারই পরশপাথররূপ যাদুস্পর্শে তাঁর কাব্য বিহার থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত অসামান্য জনপ্রিয় উঠে । পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে তুর্কী ও আফগান রাজত্বকালে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ঠ উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল । হোসেন শাহের আমলকে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের রেনেঁসা হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় । সাহিত্যে, শিল্পে, ধর্মে, সংগীতে বাঙলার নিজস্ব সংস্কৃতি, এযাবতকাল পর্যন্ত আধিপত্যকারী আর্য সংস্কৃতিকে ম্লান করে দিয়ে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হল । ইতিহাসবিদ দীনেশ চন্দ্র সেনের মতে, 'বাংলাদেশে পাঠানশক্তির যুগ এক হিসেবে বাঙলার ইতিহাসে সর্বপ্রধান যুগ । হিন্দু স্বাধীনতার সময়ে বঙ্গদেশে সভ্যতার যে শ্রী ফুটেছিল, পাঠানদের পরাধীন যুগে সেই শ্রী শতগুনে বেড়ে গিয়েছিল ।.....সেই যুগে সর্বপ্রথম হিন্দু সমাজে নূতন বিক্ষোভ আবির্ভূত হলো । .....ব্রাহ্মণেরা বাধ্য হয়ে শাস্ত্রগ্রন্থ বাঙলায় প্রচার করেন । (অর্থাৎ, শাসক শ্রেণীর ভাষা হিসেবে সংস্কৃতের আধিপত্য আর মেনে নেওয়া হলোনা) । ..... একদিকে মুসলমান ধর্মের প্রভাব, অপর দিকে বাঙলা ভাষায় ধর্মপ্রচার-এই দুই কারণে বঙ্গীয় জনসাধারণের মন নবভাবে জাগ্রত হয়েছিল (বৃহৎবঙ্গ থেকে) । .....এই পাঠান-প্রাধান্যের যুগে চিন্তাজগতে সর্বত্র অভূতপূর্ব স্বাধীনতা দৃষ্ট হলো, এই স্বাধীনতার ফলে বাঙলার প্রতিভার যেরুপ অদ্ভূত বিকাশ পেয়েছিল, এদেশের ইতিহাসে অন্য কোনও সময়ে তদ্রুপ বিকাশ সচরাচর দেখা যায়নি(নির্বাচিত প্রবন্ধ, বাংলা সাহিত্যের উপক্রমণিকা; আহ্মদ পৃঃ ৩৮)**[২] ।'

১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে সূফী দরবেশ মালিক মুহম্মদ জায়সী ভারতীয় শাস্ত্র মতে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ পদ্মাবতী লেখেন । তিনি আরবী, পারসী এবং সংস্কৃতিক সমধিক পণ্ডিত ছিলেন । ষোল শতকে বাংলা ভাষায় সূফি তত্ত্ব(যথাঃ- সূফী চর্যা, সাধন-পদ্ধতি, তত্ত্ব ও দার্শনিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ) অবলম্বনে রচিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে ষোল শতকে শেখ ফয়জুল্লাহ্‌র গোরক্ষ বিজয়, সৈয়দ সুলতানের 'জ্ঞান প্রদীপ' ইত্যাদি । বাঙলা ভাষায় সতেরো শতকে শেখ চাঁদ রচিত 'হরগৌরী সম্বাদ' ও 'তালিব নামা'; হাজী মুহম্মদের 'সুরতনামা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । আর পাঞ্জাবী সাহিত্যে সপ্তদশ শতাব্দী থেকে সূফিদের মরমী কাব্যের ধারায় বিকশিত হতে থাকে..... । সুতরাং নির্মোহ দৃষ্টিতে একথা বলা যায় যে, ইসলাম ধর্মের প্রভাব একদিন ভারতবর্ষে মানবাত্মার মুক্তি ও সভ্যতার পথে যাত্রায় অবদান রেখেছিল, ধর্ম-সংস্কারক বা মানবতাবাদীদের জন্য মুক্তি-অন্বেষার ক্ষেত্রে যুগোপযোগী চিন্তার রসদ জুগিয়েছিল, মানুষকে পথ দেখিয়েছিল ।

যে ইসলামের প্রভাবে বাঙলায় একদিন ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন, ভাব-ভক্তি ও প্রেমের বন্যা ও সর্বশেষে শিল্প-সাহিত্যে রেনেসাঁ সূচিত হয়েছিল, সেই ধর্মই আজ পশ্চাদ্‌পদতার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে, অগ্রগতির পথে অচলায়তনের মতো প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা শুধু দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত চিরন্তন বাণীকেই প্রতিভাত ও প্রাসঙ্গিক করে তুলছে ।

আজ ধর্মগুলি সারা বিশ্বে মানব সভ্যতার যাত্রাপথে এক বিশাল বোঝা হয়ে পড়েছে বলে মনে হয় । ধর্মতাত্ত্বিকরা যত তাত্ত্বিক ও পুথিগত ব্যাখ্যাই দেন না কেন, বাস্তব অবস্থাটি হচ্ছে, ধর্মকে আশ্রয় করেই আজ প্রায় এক শতাব্দী ধরে মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় উগ্রবাদের দৈত্য বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের ও মধ্যপ্রাচ্যের কিছু দেশের সমাজকে কুরে কুরে খাচ্ছে । দার্শনিক নীৎসে (১৮৪৪-১৯০০)*[১] এই বলে চার্চকে আক্রমণ করতেন, যে 'জীবন প্রবাহ ও জীবনচেতনা ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী কিন্তু চার্চ মানুষের জীবনকে ডিমের খোলসে আবদ্ধ করে রাখে । মানুষের ভিতরের

অনন্ত সম্ভাবনা ও প্রচন্ড শক্তিকে চার্চ ও ধর্ম রুদ্ধ করে রাখে ।' ধর্ম সম্বন্ধে নীৎসের এই মূল্যায়ন স্থান ও কালের বিচারে চূড়ান্ত নয়-ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে যে নয়, তা আমরা উপরে দেখিয়েছি । যে সময় বা দেশের(বা মহাদেশের) প্রেক্ষাপটে তিনি এ কথা লিখেছিলেন, সেই কালপর্বে বা তাঁর পূর্ববর্তী সময়ের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ও সংস্কৃতির প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় তিনি সম্ভবত মুক্তচিন্তা ও সৃজনশীলতার প্রসার তথা আধুনিকতার পথে মুখ্য প্রতিবন্ধকরুপে ধর্মের প্রতিক্রিয়াশীল ও অশুভ ভূমিকাকে বিবেচনা করেছেন । এখানে উল্লেখ করা খুব প্রাসঙ্গিক যে, ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে(অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর পাঁচ বছর পূর্বে) অনুষ্ঠিত নায়াগ্রা কনফারেন্স ধর্মীয় শুদ্ধতা বা রক্ষণশীলতার নামে ইতিহাস ও বিজ্ঞান চর্চার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে । তাই এটা বোধগম্য যে সমকালীন ধর্মীয় কূপমন্ডুকতা প্রত্যক্ষ করে তিনি উপরোক্ত উক্তিগুলি করে থাকতে পারেন । সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ তাঁর চিন্তাধারাকে সম্ভবত অনেকটাই প্রভাবিত করেছিল, যা হয়তো অনেকের বিচারে দেশ-কালের উর্ধ্বে উঠতে পারেনি । রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, কাব্য ও দর্শনের চিরকালীন ও সার্বজনীন আবেদনের জন্যই তাঁকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও দার্শনিক হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় ।

কিন্তু ধর্ম সম্পর্কে ফ্রেড্রীখ নীৎসের উপরে উদ্ধৃত উক্তিটি সমসাময়িক বিশ্ব ও বাংলাদেশের চলমান সময়ের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও বাস্তব । সাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে মৌলবাদের একটি অনুসঙ্গ মাত্র । তবে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ এক নয় । কেন মৌলবাদ প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবিদের কাছে, প্রগতিশীল চিন্তার সচেতন মানুষের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগ-ইস্যুতে পরিণত হলো ? এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে নিহিত রয়েছে আজকের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনার গুরুত্ব । তবে তার কিছুটা আভাস পাঠক ইতিমধ্যেই পেয়েছেন নিশ্চয়ই । '৭৫-এর পটপরিবর্তনের পরে জিয়ার শাসনপর্বে ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার হীনস্বার্থ মাথায় নিয়ে, সৌদি রাজপরিবারের সমর্থনের আশায় এবং অভ্যন্তরীনভাবে সামরিক এষ্টাব্লিশ্‌মেন্টের রাজনীতিতে স্থায়ীভাবে(কখনো প্রকাশ্যে, কখনো নেপথ্যে) প্রভাব বিস্তারের স্বার্থে, এবং 'I will make politics difficult for the politician'-এই চাণক্য-ডকট্রিনের বাস্তবায়নের উদ্দ্যেশ্যে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে স্বাধীনতাবিরোধী জামাতকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পুনর্বাসন করা শুরু করেন । সেই থেকে শুরু করে, এবং বিএনপির '৯১-'৯৬ সাল ও ২০০১-২০০৬ সালের শাসনপর্বে যথাক্রমে নেপথ্যে ও প্রকাশ্যে ক্ষমতায় থাকার সুবাদে জামাআত ও তার অঙ্গ-সংগঠনগুলো তাদের সক্রিয় ক্যাডারদের দেশের সামরিক বাহিনী, আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন, বিচার বিভাগ, পিএসসি থেকে শুরু করে প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে নজীরবিহীন দলীয়করণের মাধ্যমে দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত করে সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নিয়ে এগোতে থাকে । এর মধ্যে জামায়াত-শিবিরের একটি অংশ, কৌশলগত কারণে 'জাগ্রত মুসলিম জনতা', 'বাংলা ভাই' ইত্যাদি বিভিন্ন নাম নিয়ে , বাংলাদেশের দুর্গম অঞ্চলগুলিতে সামরিক প্রশিক্ষন ও নানা জঙ্গী তৎপরতা শুরু করে । যেসব জরুরী ও উদ্বেগজনক প্রশ্ন বাংলাদেশ রাষ্ট্রটিকে ঘিরে এখন সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো হলো--

১. বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি আফগানিস্তানের মতো একটি ব্যর্থ ও অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত হবে কিনা, এটিকে একটি মধ্যযুগীয় ধর্মরাষ্ট্রে পরিণত করা হবে কিনা সে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে প্রগতিশীল মহলের মধ্যে ।

২) মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তার মানুষদের জন্য, বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী ও প্রগতিশীল চিন্তার মানুষদের জন্য অদূর ভবিষ্যতের বাংলাদেশ আদৌ নিরাপদ থাকবে কিনা ?

৩) যে প্রত্যাশা, লক্ষ্য, স্বপ্ন, আদর্শ ও চেতনা নিয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছিল, মুক্তিযুদ্ধের সেই চেতনা আজ ভুলুণ্ঠিত । ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, গনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, মৌলিক অধিকার, নারী-পুরুষ সমতা, বুদ্ধির মুক্তি এবং বিবেকের স্বাধীনতা ইত্যাদি মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত চেতনাগুলি জাতীয় জীবনে ও সংবিধানে পুনপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা কি বাংলাদেশে আরেকটি নবজাগরণ ও সংস্কারমুক্তির লক্ষ্যে আলোকিত মননশীলতার আন্দোলন (Enlightenment) সূচিত করতে পারব কিনা, একটি জ্ঞানভিত্তিক বৈষম্যহীন শোষনহীন আধুনিক সমাজ নির্মাণের দিকে এগিয়ে যেতে পারব কিনা, নাকি অদৃষ্ট ও ঐশীনির্ভর, আধা-রাজতান্ত্রিক এবং সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় একটি পুরোপুরি কূপমন্ডূক, বদ্ধ ও বন্ধ্যা সমাজের(এই বন্ধ্যাত্ব ইতিমধ্যেই সমাজ জীবনে পরিলক্ষিত) দিকে ধাবিত হবো,

প্রান্তিক থেকে প্রান্তিকতর তথা ভিক্ষুক-অর্থনীতির দেশে পরিণত হবো ?

৪) বিশ্বমানচিত্রে বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান পরাশক্তিগুলির জন্য সামরিক দিক থেকে কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । চট্টগ্রাম বন্দর, সেন্ট মার্টিন দ্বীপ এবং বাংলাদেশের তেল-গ্যাসের সম্ভাব্য(Anticipated) নিত্য-নতুন আবিষ্কার ও ক্রম-উৎপাদন বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বৃহৎ শক্তিগুলোর যে লোলুপ দৃষ্টি বহুদিন যাবৎ এ দেশটির উপর রয়েছে, তা দেশটির স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বর জন্য
হুমকিস্বরুপ ।

এখন, আজকের ইরাক-যুদ্ধ থেকে বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্র জাতিরাষ্ট্রগুলো কি শিক্ষা নিতে পার ? ইরাকে যে এখনো মার্কিনীরা অবস্থান করতে পারছে, ওখানকার সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য তথা এনার্জি সেক্টর(বিদ্যুত, তেল গ্যাস আহরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) টেলিফোন, ব্যাংকিং ইত্যাদি যেসব সেক্টরগুলি জনগনের মালিকানায় ছিল, সেগুলি এখন বিশ্বায়ন ও প্রাইভেটাইজেশনের নামে মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে, তার কারণ শুধু এই নয় যে ওখানকার শাসক এলিট ও দেশপ্রেমহীন বুর্জোয়াদের একটি অংশ এবং সামরিক-বেসামরিক এষ্টাব্লিশ্‌মেন্ট নিজেদের অবস্থানগত ও শ্রেণিগত স্বার্থে মার্কিনীদেরকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে । কারণটি হলো আরো গভীরে,সেটি তাদের দীর্ঘ ঐতিহাসিক সমস্যা-ঐতিহাসিক ও অংশত অদূরদর্শী সাদ্দামের দীর্ঘ দিনের শিয়াবিরোধী সাম্প্রদায়িক দমন-পীড়ন নীতির কারণে ইরাকে সত্যিকারের কোন জাতীয়তাবোধ গড়ে উঠতে পারেনি । শিয়াদের প্রতি সাদ্দাম আমলে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয় । শিয়া-সুন্নী বিভেদ ছাড়াও গোত্রে-গোত্রে বিভেদ, স্বতন্ত্র জাতিসত্ত্বা হিসেবে কুর্দীদের স্বাধীনতা দাবী ইত্যাদি জটিল সমস্যা ইরাকের সমাজে দীর্ঘদিন থেকেই চলে আসছে । দীর্ঘ দিনের এই গোত্র-বিভক্তি(Sectarianism), সাম্প্রদায়িক বিভক্তি এবং কুর্দী, এজীদী প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতি তথা ভিন্ন জাতিপরিচয়কে যথাযথভাবে মর্যাদা ও মূল্যায়ন না করার কারণে ইরাক কখনই একটি জাতিরাষ্ট্র(Nation state) হিসেবে বিকশিত হতে পারেনি । কুর্দীদের ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিচয়কে মেনে নিয়ে, অসাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয়াতাবাদ বিকাশ লাভ করতে পারেনি কোন দূরদর্শী ক্যারিশমেটিক নেতার অভাবে । তো এমনি একটি পটভূমিতে, যখন ইরাকে মার্কিন আগ্রাসন সংগঠিত হলো দেশটির তেলসম্পদ গ্রাস করার জন্য(যার মূল লক্ষ্য ছিল বিশ্বব্যাপি এনার্জি তথা জ্বালানী সম্পদের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে য়ুরোপ , রাশিয়া ও চীনের উপর খবরদারি ও আধিপত্য বিস্তার; তাছাড়া তেলের নিশ্চিত সরবরাহের সাথে একটি শিল্পসমৃদ্ধ অর্থনীতির বহু সূচক নির্ভর করে, যা ভিন্ন আলোচনার বিষয়), তখন ইরাকে সত্যিকারের ঐক্যবদ্ধ কোন প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে উঠেনি । এর আরেকটি কারণ, একদিকে, সাদ্দাম আমলে বৈষম্যের শিকার শিয়াদের একটা বড় অংশ, বিশেষ করে এলিট অংশটি মার্কিনীদেরকে ক্ষমতা ও তথাকথিত মার্কিনী মডেলের নিয়ন্ত্রিত পূজিবাদী গনতন্ত্রের লোভে সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে । প্রতিরোধ যোদ্ধাদের মধ্যে বহু দলাদলি ও বিভক্তি কাজ করছে, যার অন্যতম কারণ হলো 'আয়াতুল্লা প্রথা'*[২]। আবার যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বহিরাগত হিসেবে 'গোদের উপর বিষফোঁড়ার' মত মৌলবাদী সংগঠন 'আলকায়েদার' মার্কিনীদের শায়েস্তা করার মোক্ষম সুযোগ হিসেবে ইরাকের মাটিকে বেছে নেয়া, যারা শিয়াদের উপর মার্কিন-প্রীতির প্রতিশোধ নিতে গিয়ে যে বর্বর হত্যাকান্ড ঘটাচ্ছে তা জাতির বিভক্তি আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে ।

ইরাকের উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস থেকে আমরা কি শিক্ষা নিতে পারি ?

১. ব্যক্তির খেয়াল-খুশী, উচ্চাকাঙ্খা চরিতার্থকরণে ও ক্ষমতা নিরঙ্কুষ করার স্বার্থে যে স্বৈরাচারী ও বৈষম্যমূলক শাসন চালানো হয় দীর্ঘদিন ধরে, তা ঐ শাসক সম্প্রদায় বা রেজিম যতদিন ক্ষমতায় থাকে ততদিনই ঐ অগণতান্ত্রিক সিস্টেমটি কাজ করে, এরপর যখন ঐ রেজিমের পতন ঘটে, তখন ঐ সিস্টেমের ক্ষতিকর দিকগুলি বেরিয়ে পড়ে ।

২. সি আই এ'র সহযোগিতায় ক্ষমতায় আসা সাদ্দামের শাসনামলে ইরাক রাষ্ট্রটির(খেয়াল করুন, জাতি নয়) অভ্যন্তরে যে বিভিন্ন অসামঞ্জস্য, বৈষম্য, বিভক্তি, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি রোগগুলি ভেতরে ভেতরে বিরাজমান ছিল, তা কিন্তু সাদ্দামের বাথ পার্টির দোর্দন্ড-প্রতাপ স্বৈরশাসনের মধ্যে মানুষের কোন বাক্-স্বাধীনতা, সংবাদপত্র ও তথ্যের স্বাধীনতা প্রভৃতির অভাবের কারণে চাপা পড়ে গিয়েছিল । কিন্তু, তার মানে এই নয় যে সমস্যাগুলি ছিলনা, তবে সেগুলি প্রকাশ হওয়ার সুযোগ ও পরিবেশ পায়নি ।

এখন মার্কিনীরা আসার পর,(যেমন সেন রাজবংশের পতন-পর্বে মুসলিম শক্তির আবির্ভাবে-[যাদের উদ্দ্যেশ্য ছিল রাজ্য-জয় বা অর্থসম্পদলুন্ঠন] তৎকালীন হিন্দু সমাজের এক উল্লেখযোগ্য অংশই মুক্তির স্বাদ পেয়ে আনন্দিত হয়েছিল,) পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, বহুবছর ধরে অবদমিত থেকে হঠাৎ করে মুক্তির স্বাদ পেলে যা হয়(বিষ না অমৃত তা' বিচারের ক্ষমতা আর থাকেনা), পেন্ডোরার বাক্স*[৩] খুলে গেল । প্রথম-প্রথম গণতন্ত্র মনে করে যেভাবে আহ্লাদিত হয়েছিল নির্বোধের মত, ধাক্কা খেয়ে এখন ধীরে ধীরে ভুল
ভেঙ্গেছে ।

এতক্ষণ ধরে ইরাক নিয়ে যে দীর্ঘ আলোচনা করা হলো, তার উদ্দ্যেশ্যটা আশা করি পাঠক হৃদয়ঙ্গম করেছেন । আমি চার নম্বর পয়েন্টের বক্তব্যের শুরুতে(উপরে দেখুন) ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশের কৌশলগত বিপজ্জনক অবস্থান এবং তেল-গ্যাস-বন্দর-সেন্ট মার্টিন দ্বীপ প্রভৃতির বিপজ্জনক দিকগুলোর ব্যাপারে আলোচনা করেছিলাম । এমতাবস্থায়, বাংলাদেশে ইসলামীক সন্ত্রাসী, জঙ্গী ও মৌলবাদী উত্থাণের সুবাদে,(যার পৃষ্ঠপোষকতা সৌদি আরব ও যুক্তরাষ্ট্র দিয়ে চলেছে) যদি এখানে পশ্চিমা শক্তিগুলির হস্তক্ষেপের অজুহাত সৃষ্টি হয়, শিক্ষিত শ্রেণীর একটি অংশ এবং সেনাবাহীনীর হাতে নির্যাতিত উপজাতিগোষ্ঠীগুলো ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদেরকে সহযোগিতা না করলেও '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মত কোন প্রতিরোধযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে বলে মনে হয়না । গ্রামে-গঞ্জের অগণিত হতাশ মুক্তিযোদ্ধা, যারা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি, দারিদ্রের মধ্যে বাস করছে এবং বহুস্থানেই স্থানীয় রাজাকারদের কাছে ব্যক্তিগত বা সরকারী বাড়ী বা সম্পত্তি হারিয়েছে, অত্যাচারিত হয়েছে বিএনপি-জামাআত সরকারের সময়, তাদের সন্তানরা হিসেব করবে নিশ্চয়ই যে '৭১-এর যুদ্ধে গিয়ে তাদের বাবারা কি পেয়েছিল । তারা দেশটিকে সেনাবাহীনীর দেশ, গ্রাম্য চেয়ারম্যান-টিএনও-ডিসি-এসপি-আমলা-এলিট-মুৎসুদ্দি ব্যবসায়ী বা বুর্জোয়া-(সেনাবাহিনীর আশীর্বাদপ্রাপ্ত ও ভাগীদার)সিন্ডিকেট চক্র প্রভৃতি নব্য মৌলিক গণতন্ত্রের(আইয়ুব খানেরটা ছিল পুরনো মডেল) হালুয়াভোগীদের দেশ বলেই ভাববে-নিজেদের দেশ বলে ভাববেনা । মোদ্দা কথা, দেশটির মানুষ কার্যত দুই ভাগ-চতুর্ভাগ হয়ে যাবে । অবশ্য বাংলাদেশে এখনই প্রকৃত প্রস্তাবে দুটো জাতি বাস করছে অন্তর্গত মননের দিক থেকে এবং জাতিসত্ত্বার প্রশ্নে । এক পক্ষ হলো যারা নিজেদের বাঙালী বলেই মনে করে-যারা অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তায় বিশ্বাসী । অন্য পক্ষ মুসলিম জাতীয়তা ও পাকিস্তানী সংস্কৃতি এবং পাকিস্তানী জাতীয়তায় বিশ্বাস করে, যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে 'পাকিস্তান ভাঙা' বলে মনে করে এবং তারা মনে মনে নিজেদেরকে পাকিস্তানী বলে গর্ববোধ করে । বিদেশী শক্তি অনুপ্রবেশের সাথে সাথে এ দুটো জাতিগত প্রবণতার মধ্যে হানাহানি শুরু হতে পারে এবং বাংলাদেশ নামক ভুখন্ডটিকে পুনদ্বিখন্ডিতকরণের প্রস্তাব বা প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে ।

আমাদের জাতিপরিচয় বা আত্মপরিচয়ের যে সংকট, তার একটি প্রধান কারণ হচ্ছে এই মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা । মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা এমন দুটি বিষাক্ত রোগ যার চিকিৎসার পূর্বে রোগ দুটিকে ভাল করে জানতে হবে । আর মৌলবাদ যদি অন্তর্নিহিত দূরারোগ্য রোগের সিম্প্টম হয়ে থাকে, তবে আমাদের প্রথম কাজ হবে রোগটিকে আগে জানা । রোগটিকে না জানলে রোগের ডায়াগনসিস আমরা করতে পারব না ।

টীকাঃ--

১. ফ্রেড্রীখ উইলহেল্ম নীৎসে(১৮৪৪-১৯০০)-উনিশ শতাব্দীর জার্মান দার্শনিক ও ভাষাবিজ্ঞানী । ধর্ম, নৈতিকতা, সমকালীন সংস্কৃতি, দর্শন এবং বিজ্ঞান বিষয়ে সমালোচনামূলক(critique) গ্রন্থ লেখেন । নীৎসের প্রভাব দর্শনকে অতিক্রম করে অস্তিত্ববাদ(Existentialism) ও উত্তরাধুনিকতা পর্যন্ত ব্যাপ্তিলাভ করে।

অস্তিত্ববাদ(Existentialism)- হচ্ছে জার্মানীতে সংগঠিত একটি দার্শনিক আন্দোলন যাতে প্রস্তাব করা হয় যে ব্যক্তিমানুষই জীবনের অর্থ ও সারবত্তাকে(জীবনবোধ) সৃষ্টি করে, সহজ কথায় জীবনকে অর্থময় করে তোলে-কোনরকম ঈশ্বর-দেবতা বা ঐশী শক্তি সেটা তার জন্য করে দেয় না । অস্তিত্ববাদ স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে স্বীকার করে নেয়, যে অতিপ্রাকৃত বা ঐশী শক্তির অনুপস্থিতির মানে দাঁড়ায়, ব্যক্তি মানুষ সম্পূর্ণরুপে স্বাধীন, তাই চূড়ান্তভাবে আপন কর্মের দায়দায়িত্ব বহনকারী ।.....

২. আয়াতুল্লা প্রথা-'আয়াতুল্লাহ্'(আরবীতে হলো :)-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে 'খোদার চিহ্ন' বা 'খোদার ছায়া' । 'Twelver shi'sm'(আরবীতে 'ইথনাশারীয়াহ্; বা 'দ্বাদশ' শিয়া মতবাদ বা দ্বাদশ ইমাম)-এ আয়াতুল্লা হচ্ছে ইমামদের সামাজিক প্রভাব দ্বারা সমর্থিত উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ ধর্মীয় কর্তৃত্ব বা পদবী । আয়াতুল্লাহ্র অনুসারীরা তাদের ধর্মীয় নেতার কথাকেই নবী বা খোদার কথা বলে মনে করে । কোণ একটি সেক্টের আয়াতুল্লাহ্ ও তাঁর অনুসারী বা ভক্তদের মধ্যে 'পৃষ্ঠপোষক ও পোষ্য'-জাতীয় সম্পর্ক থাকে । কোন বিশেষ এলাকার ধর্মীয় নেতা(বা আয়াতুল্লাহ্)-র অনুসারীরা আয়াতুল্লাহ্র কাছে তাদের ধর্মীয়, সামাজিক, আর্থিক(যেমন-স্কুল, মসজিদ, হাসপাতাল প্রভৃতি নির্মাণের জন্য) ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ ও মুখোমুখি মন্ত্রণা গ্রহণের জন্য আয়াতুল্লাহ্র উপর নির্ভর করে থাকে । পরিবর্তে অনুসারীরা আয়াতুল্লাহ্কে 'পবিত্র আনুগত্য' দিয়ে থাকে যেকোন ব্যাপারে-যেমন, রাজনৈতিক-রাস্ট্রীয় বা সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইস্যুতে ।

Twelver shi'sm'*(ইথনাশারীয়াহ্)-এটি হচ্ছে শিয়া সম্প্রদায়ের একটি শাখা বা সেক্ট যা আবার একটি বিশ্বাস বা আদর্শর উপর ভিত্তি করে প্রথা হিসেবে চলে আসছে বহু যুগ ধরে । এটা দিয়ে পদবীও বুঝানো হয় । এটা এই বিশ্বাস থেকে এসেছে যে 'দ্বাদশ ইমাম' হচ্ছে বারোজন খোদা-নিযুক্ত(Divinely) ইমাম বা আধ্যাত্মিক নেতা বা প্রতিনিধি । যিনি ইসলামী জ্ঞান তথা ইসলামী আইনশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র এবং দর্শনে বহু বছরের শিক্ষালাভের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ প্রাজ্ঞরুপে পরীক্ষিত ও স্বীকৃত তাঁকেই আয়াতুল্লাহ্ খেতাবে ভূষিত করা হয় । এই প্রথা অনুযায়ী, দ্বাদশ ইমাম সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে, বারো ইমাম হজরত মুহম্মদের(সঃ) কন্যা ফাতিমা ও জামাতা আলীর বংশধর, যারা কোরানের জ্ঞানের নির্ভরযোগ্য উৎস; মহম্মদের সুন্নাহ্র সবচেয়ে বিশ্বস্ত বাহন ও রক্ষক । দ্বাদশ ইমামদেরকে মুহম্মদের আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী হিসেবে বিশ্বাস করা হয় তাদের শিষ্যদের দ্বারা । 'দ্বাদশ ইমামের' ধর্মতাত্ত্বিক কনসেপ্ট অনুযায়ী মুহম্মদের উত্তরাধিকারীরা হচ্ছেন ত্রুটিহীন পবিত্র মানব, যারা সমাজে শুধু ন্যায়ের মাধ্যমে শসনই করেননা, রসুলুল্লাহ্র পবিত্র আইন বা শরীয়ার সঠিক ব্যাখ্যা ও রক্ষা করতে এবং কোরআনের গুপ্ত ও মরমী তাৎপর্য ব্যাখ্যায় সক্ষম । দ্বাদশ ইমাম সম্প্রদায়ের বিশ্বাস অনুসারে, সব যুগের জন্যই একজন আধ্যাত্মিক নেতা থাকেন, যাকে খোদার ইচ্ছায় নিযুক্ত করা হয় কোন মুসলিম সম্প্রদায় বা সমাজের ধর্মীয় বিধান ও বিশ্বাস সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষেত্রে প্রামাণ্য কর্তৃত্ব দিয়ে । বংশগত রক্তের লাইন অনুসারে আলী হচ্ছেন এও রক্তের লাইনের প্রথম ইমাম বা আধ্যাত্মিক নেতা ।

*৩--গ্রীক পূরাণে কথিত 'পেন্ডোরা'(যার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'সমস্ত কিছুর দাতা', 'সমস্ত গুণাবলীর দাতা') ছিল

প্রথম নারী । প্রত্যেক গ্রীক দেবতা অনুপম উপহারের মাধ্যমে তাঁকে সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিলেন । দেবতাদের প্রধান জিউস কারিগরি শিল্পের দেবতা হেফিস্টাসকে আদেশ করলেন পেন্ডোরাকে মাটির ছাঁচে তৈরী করতে । এটা ছিল প্রমিথিউসের আগুনের গুপ্ত রহস্য চুরি করার অপরাধে মানবজাতির শাস্তি । সমস্ত দেবতারা তাকে অনিষ্টকর ক্ষমতাসম্পন্ন উপহার দিলেন । আধুনিক ব্যাখ্যানুযায়ী, পুরা কাহিনীর মূল ঘটনা হলো, ওটা ছিল আসলে একটি জার(Jar), যার ঢাকনা পেন্ডোরা খুলে দিয়েছিল এবং যার ভিতর থেকে মানবজাতির জন্য অমঙ্গলজনক সমস্ত কিছুকে মুক্ত করে দিল-লোভ-লালসা, অহঙ্কার, কুৎসা রটনা, ঈর্ষা, শত্রুতা, রোগ, হতাশা-নৈরাশ্য, বার্ধক্য, মৃত্যু, সন্ত্রাস, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি । শুধু একটি জিনিসই ঐ জারের মধ্যে ছিল- সেটি হলো আশা । তারপর পেন্ডোরা জারটি বন্ধ করে দিল ।(তথ্যসূত্র-উইকিপিডিয়া, গোগল, ইন্টারনেট থেকে)

তথ্যসূত্রঃ--

**১-প্রত্যক্ষ সূত্র-(প্রবন্ধ-)'চৈতন্য মতবাদ ও ইসলাম', 'নির্বাচিত প্রবন্ধ' গ্রন্থ থেকে; ডক্টর আহ্‌মদ শরীফ, পৃঃ ১৪৭। পরোক্ষ সূত্র-'সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস'-ডক্টর আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ্‌, ১ম সং, পৃঃ ১৪৮-৪৯।

**২-'নির্বাচিত প্রবন্ধের' অন্তর্গত 'বাঙলা সাহিত্যের উপক্রমণিকা' প্রবন্ধ থেকে; ডক্টর আহ্‌মদ শরীফ ।